Vol. 53 | No. 3 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জগদীশ গুপ্তের গল্প : জীবনাভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান

Volume	53
Issue	3
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	পারভীন আক্তার জেমী
Published online	June 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i3.4
Pages	৭১-৮৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

জগদীশ গুপ্তের গল্প : জীবনাভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান

পারভীন আক্তার জেমী*

সার-সংক্ষেপ : যুগের বৈশিষ্ট্যকে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ধারণ করে যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রম তিনি জগদীশ গুপ্ত। *কল্লোল* পত্রিকায় বা কল্লোলগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যধর্মের যে পরিবর্তন প্রত্যাশিত ছিল একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনায় তার সার্থক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। জগদীশ গুপ্তের চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস এবং জীবনকে দেখার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের মনের বিচিত্র দিককে অবলোকন করার মানসিকতা তাঁর সৃষ্টির আড়ালে শক্তি যুগিয়েছে। পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িককালের সাহিত্যিকদের থেকে জগদীশ গুপ্ত তাই আলাদা ও ব্যতিক্রম। জীবনকে তিনি খুব কাছ থেকে অবলোকন করেছেন। নিজেকে দর্শকের সারিতে রেখে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে, জীবনের নেতিবাচক দিকগুলোকে নগ্ন ও জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তোলার সাহস তিনি দেখিয়েছেন। ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পসুষমায় ফুটে উঠেছে।

অতিক্রান্ত সময়কে ধারণ করার মতো মেধা ও মনন যাঁর ছিল, গ্রামীণ আবহে পরিবর্ধিত হয়েও কল্লোলযুগের বৈশিষ্ট্য যাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে, ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা যাঁর লেখায় জীবন্ত, জীবনাভিজ্ঞতাকে প্রথাগত কাঠামোতে না ফেলে একেবারে স্পষ্ট, নগ্নভাবে ফুটিয়ে তোলার সাহস ও মানসিকতা যাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া যায় তিনি কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। জীবন তাঁকে চালিত করেছে, লালিত করেছে। জীবনের কঠিন, তিক্ত অভিজ্ঞতাকে তিনি এড়িয়ে যাননি। এমনকি পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের মতো সাহিত্যে কল্যাণ ও মঙ্গলময়ী রূপকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসও ব্যক্ত করেননি; নিজেকে একজন দর্শকের সারিতে রেখে জীবনকে যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। এখানেই সমসাময়িক সাহিত্যিকদের থেকে জগদীশ গুপ্ত ব্যাতিক্রম। "জগদীশ গুপ্ত যখন গ্রামীণ

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন তখন কোমল-করুণ ও সহানুভূতিশীল অনুভূতিগুলোকে সজীব ও ক্রিয়াশীল রেখে তিক্ততা ও গভীর অপ্রীতিকে পাশ কাটিয়ে যাননি এবং এখানেই শরৎচন্দ্র এবং অপরাপর কথাসাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান।" (মান্নান, ২০০১ : ১১২) জীবনাভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধিজাত জীবনের বিচিত্ররূপ, রস, গন্ধকে তিনি ছোটগল্পে চিত্রায়িত করেছেন।

সাহিত্যজগতে জগদীশ গুপ্তের আবির্ভাবের পূর্বে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে বাংলাদেশে কতকগুলো নব্যশ্রেণির উন্মেষ ঘটে। এরা হলো – জমিদার, পত্তনিদার ও মহাজন। এরা সমাজে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নামে পরিচিতি লাভ করে। বিশ শতকের শুরুতে এরা সমাজে বিকশিত হয়। এর পাশাপাশি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে নাগরিক সমাজের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের চিরকালীন গ্রামীণ সমাজেও বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণিতে শিক্ষার প্রভাব পড়ে। তারাও লেখাপড়া শিখে সামাজিক মর্যাদা লাভে তৎপর হয়। মানুষ শহরমুখী হতে শুরু করে। বৈষয়িক চিন্তা মানুষের ভেতর প্রকট আকার ধারণ করে এবং মানুষ জড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব, সংকট, অসামাজিক কর্মে, পাপের পথে। মানুষ হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ, ক্ষত-বিক্ষত সংকটসঙ্কুল সময়ে অর্থাৎ, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) মানুষের সে অসহায়তাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

গ্রামীণ আবহ ছেড়ে নাগরিক জীবন হয়ে ওঠে সাহিত্যেরও কেন্দ্রবিন্দু। সে সাথে সাহিত্যে প্রভাব পড়ে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতা, যুদ্ধোত্তর হতাশা, গ্লানি ও নৈরাশ্যের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও রাউলাট অ্যাক্ট (১৯১৮), কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪), মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯), রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) দেশজুড়ে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। সে-যুগের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে সাহিত্য পত্রিকা *কল্লোল* (১৩৩০) বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবই বিশেষভাবে কাজ করে। *কল্লোল* পত্রিকার পাশাপাশি *কালিকলম* (১৯২৬), *প্রগতি* (১৯২৭), *পরিচয়* (১৯৩১) প্রভৃতি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। *কল্লোল* পত্রিকার নামানুসারে কল্লোলের লেখকবৃন্দ 'কল্লোল গোষ্ঠী' নামে অভিহিত হন। এই সময়কে বলা হয় কল্লোল যুগ। *কল্লোল* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১), সহ সম্পাদক গোকুল চন্দ্র নাগ (১৮৯৪- ১৯২৫)। যে সব নবীন সাহিত্যিকের লেখা *কল্লোলে* প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭-১৯৮৬), জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৭৬), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র

(১৯০৪-৮৮), প্রবোধ কুমার সান্যাল (১৯০৭-৮৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) প্রমুখ।

সে-সময়ের প্রেক্ষাপট অবলোকন করে সমরেশ মজুমদার লিখেছেন :

> ভারতবর্ষের একটি তাৎপর্যময় পরিস্থিতিতে 'কল্লোল' লেখনী ধারণ করেছিল। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের অস্থিরতা, সমাজ জীবনে মানুষের বোধের অধোগতি, আত্মস্বাতন্ত্র্যের আবির্ভাবজনিত অস্বাচ্ছন্দ্য, মনুষ্যত্বের মূল্যবোধহীনতা তৎকালীন যুবচিত্তে একাধারে নৈরাজ্য, ব্যর্থতাবোধ ও পরিণামহীন বিশুদ্ধ ভবিষ্যৎ জাগরুক হয়েছিল। (সমরেশ, ১৯৮৮ : ৪৭)

যে আধুনিকতাকে কল্লোলগোষ্ঠী সাহিত্যে ধারণ করতে চেয়েছিল, সমস্ত বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের উৎখাত, সৃষ্টির কল্লোলে যৌবনের উদ্দামতায় ভেসে যেতে চেয়েছিল তা জগদীশ গুপ্তের রচনায় খুঁজে পাওয়া যায়। বয়সের সীমারেখা জগদীশ গুপ্তের ভাবনাকে আড়াল করতে পারেনি। জীবনের বিপরীত জিজ্ঞাসা, চাওয়া-পাওয়া জগদীশ গুপ্তের গল্পে সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে – কখনো নিয়তির আড়ালে, নারীর নতুন স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে, প্রেমের আত্মিক ও মানসিক চাহিদার মধ্য দিয়ে, নারীর মাতৃত্বের রূপ অঙ্কনে, প্রভুত্ব বিস্তারে, লোভ-লালসা, সামাজিক মর্যাদা, কুসংস্কার, ঠক, প্রবঞ্চক এবং স্বার্থপরতার চিত্র রূপায়ণে। এসব সৃষ্টির আড়ালে শক্তি যুগিয়েছে তাঁর চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস এবং এদের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা। বয়স তাঁর অভিজ্ঞতাকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁর অভিজ্ঞতা কখনো জীবনের নেতিবাচক সীমারেখাকে এড়িয়ে যায়নি। বাস্তব সত্যকে রূপায়ণের চেষ্টায় সমাজের নৈরাশ্যের দিকটি প্রবলমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ছোটগল্পে।

জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে নারী চরিত্রগুলো নতুন জীবনদৃষ্টি নিয়ে রূপায়িত হয়েছে। নারীর চিরপরিচিত মাতৃত্বের স্বরূপ অঙ্কনে জগদীশ গুপ্ত যেমন সমুজ্জ্বল, তেমনি নারীর ভেতরের অন্তর্সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনেও তিনি স্বতন্ত্র। নারীর স্বকীয়তা নারীর ব্যক্তিত্বকে মাধুর্যমণ্ডিত করে এ সত্য জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে নিপুণভাবে রূপায়িত হয়েছে। নারী শুধু কামনার বস্তু নয়, নারী চায় আলাদা মর্যাদা, নারী তার মনোদৈহিক চাহিদা পূর্ণ করার বাসনা প্রকাশ করার ইচ্ছা সাহসের সাথে প্রকাশ করতে চায়। নারী জীবনের সব অপূর্ণতাকে, মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়– এ সত্যের জীবনালেখ্য এঁকেছেন জগদীশ গুপ্ত। সব কিছু ছাপিয়ে তারা আবার নিয়তির বিধানকেও অস্বীকার করতে পারেননি। "জগদীশ গুপ্তের নর-নারী দেশ-কাল ও সমাজ কাঠামোর অসঙ্গতিজাত বাস্তবতার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, নৈরাশ্যে আতঙ্কিত এবং পরিণামে অদৃষ্টে সমর্পিত।" (ভীষ্মদেব, ১৩৯৫ : ১৯) 'বিধবা রতিমঞ্জরী' গল্পে রতি মঞ্জরী স্বামীর ভালোবাসা-বঞ্চিত এক নারী। তাকে স্বামী শুধু ভোগের সামগ্রীই মনে করেছে। এ সত্য যেদিন রতিমঞ্জরী উপলব্ধি করতে পারল সেদিন স্বামীর প্রতি তার সমস্ত ভক্তি,

শ্রদ্ধা নিঃশেষ হয়ে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসের ভ্রমর চরিত্রের মতোই রতিমঞ্জরী উপলব্ধি করতে পারল স্বামী যতদিন ভক্তির যোগ্য ততদিনই ভক্তি। তাই রতিমঞ্জরীর স্বামীর মৃত্যু তাকে নাড়া দেয়নি। হৃদয়ের গহীনে রতিমঞ্জরী স্বামীর জন্য কোনো রকমের শোক উপলব্ধি করেনি। শুধুমাত্র সমাজ-সংসারকে দেখানোর জন্য শোকের ভান করেছে, আচার-অনুষ্ঠান পালন করেছে। ভেতরে জেগে উঠেছে তার নারীসত্তা। জীবনকে নিঃশেষ না করে দেয়ার প্রত্যয়। নারীরও জীবনকে উপভোগ করার অধিকার আছে। সমাজবাস্তবতাকে উপেক্ষা করে, সমাজের বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনকে উপেক্ষা করে সমাজের ভেতর বেঁচে থাকার বাসনা রতিমঞ্জরীকে পেয়ে বসে। বিধবা হয়েও আবার নতুন জীবন শুরু করতে চায়। স্বপ্ন দেখে এমন কারো যাকে সে ভালোবেসে জীবনসঙ্গী করে নেবে। তাকে শ্রদ্ধা করবে। বিধবা হয়েও পত্রিকায় বিবাহের বিজ্ঞপ্তি দেয়। কিন্তু রতিমঞ্জরীর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। নিষ্ঠুর নিয়তির প্রভাব যতখানি, তার চেয়ে সমাজ, সমাজের বিধি-নিষেধ তার স্বপ্নপূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিধবা নারীর জীবনের গতি সম্মুখে আর ধাবিত হবে না, একই বৃত্তে ঘুরপাক খাবে– এ নিয়ম থেকে বিধবা রতিমঞ্জরী আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। বিধবা নারীর চাওয়াকে সমাজ শেষ পর্যন্ত অসম্মানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিল। আত্মীয়-পরিজন-সমাজ তাকে ত্যাগ করল। জীবনকে পূর্ণ করার জন্য কেউ রতিমঞ্জরীর কাছে এগিয়ে আসেনি। বিবাহের বন্ধনে বাঁধা পড়ে রতিমঞ্জরী যে জীবনকে পেয়েছিল, আজ জীবনকে পূর্ণ করতে গিয়ে সমাজের একই বৃত্তে রতিমঞ্জরী নিক্ষিপ্ত হল। রতিমঞ্জরী কিছুতেই সে দেহকে অতিক্রম করে নারী হয়ে উঠতে পারেনি। নিয়তি নয়, সমাজই তাকে এ পথে নিক্ষিপ্ত করেছে। জগদীশ গুপ্ত একজন নারীর মনোজগতকে নারীর মানসিকতা দিয়ে অবলোকন করেছেন। তাদের ভেতরের যন্ত্রণাকে টেনে বাইরে আনার সাহস দেখিয়েছেন। সমাজের প্রচলিত রীতির কাছে নারীর চিন্তা-চেতনার কতখানি মূল্য বা মর্যাদা– এ সত্যকে জগদীশ গুপ্ত সত্যদ্রষ্টার মতো ফুটিয়ে তুলেছেন। পতিতাপল্লির সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের মা সৌদামিনীর ছিল আন্তরিক সম্পর্ক। ছেলেবেলার সে অভিজ্ঞতা রতিমঞ্জরী চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে তাঁকে সাহায্য করেছে।

'চন্দ্র-সূর্য যতদিন' গল্পে নারীর আত্মমর্যাদা রূপায়ণে ক্ষণপ্রভা চরিত্রটি বিস্ময়কর। উনিশ বছরের এক সন্তানের জননী ক্ষণপ্রভার স্বামী দীনতারণ বাবার আদেশে, বংশগত প্রথায় অথবা সম্পত্তির লোভে প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ক্ষণপ্রভার সহোদরা প্রফুল্লকে বিবাহ করে। নারী এখানে হয়ে ওঠে শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী। যে স্বামীকে ক্ষণপ্রভা মনে-প্রাণে ভালোবেসেছে, তারই ঔরসজাত সন্তানের মা হয়েছে, সে স্বামীকে আজ তার কাছে শুধু একখণ্ড মাংসপিণ্ডের মতো মনে হয়। ক্ষণপ্রভা উপলব্ধি করল দীনতারণ তাকে কখনো ভালোবাসেনি। নবযৌবনা প্রফুল্ল এখন তার আকর্ষণের বস্তু। ক্ষণপ্রভা অপমানিত বোধ করল। তার আত্মসম্মান তাকে আঘাত

করল। ভেতরে ভেতরে তার অন্তঃক্ষরণ চলল। ক্ষণপ্রভা শুধু নিজের জন্য কষ্ট অনুভব করল না, বোন প্রফুল্লের জন্যও তার কষ্ট আর সহানুভূতি জাগল। যে অন্তর্দৃষ্টি, যে বোধ ক্ষণপ্রভার ছিল, প্রফুল্লর তা ছিল না। প্রফুল্ল যাকে ভালোবাসার পূর্ণতা মনে করে আত্মতৃপ্তি ও সুখের দোলায় দোল খাচ্ছিল তা যে নিছক ভোগের তা শুধু ক্ষণপ্রভাই বুঝতে পেরেছে। নবীন বয়সে দৈহিক সুখের পর যখন বোধ জেগে উঠবে তখন প্রফুল্ল বুঝতে পারবে যে ভালোবাসাকে তারা স্পর্শ করতে পারেনি। সে কষ্টেই ক্ষণপ্রভার চোখে জল এসেছিল। অন্যরা হয়তো তা সতীনকে সহ্য করার যন্ত্রণারূপে আখ্যায়িত করেছে। বাস্তবসত্য তা নয়। ক্ষণপ্রভার এ কষ্ট তার শাশুড়ি কিছুটা বুঝতে পারলেও তার ধারণা ছিল সীমাবদ্ধ। সাধারণ নারীর মতো প্রথাগত ধারণার গণ্ডিকে সে অতিক্রম করতে পারেনি। একজন নারীর হৃদয়ের ক্ষরণ, উপেক্ষিত হওয়ার কষ্ট যে কী, বোধশক্তিসম্পন্ন নারীই শুধু তা উপলব্ধি করতে পারে। তাইতো বোন প্রফুল্লর জন্য কষ্টে চোখে জল এসেছিল ক্ষণপ্রভার। মনে মনে সে ভাবল –

> ...ইহার অদৃষ্টও তো তাহারই মতো, ঊর্ণনাভের তন্তুকেই এ-ও প্রেমের বন্ধন বলিয়া ভুল করিতেছে; ভোগের কেবলই বর্ধিষ্ণু ক্ষুধার মুখে আহার তুলিয়া দিয়া এ-ও মনে করিতেছে জীবনের চরিতার্থতার কিছু বাকি রহিল না। কিন্তু যেদিন আত্মার ক্ষুধার মিটাইবার দিন আসিবে – সে-দাবি যখন আর কোনো কথা কানে তুলিতে চাহিবে না ...তখনই মায়াবীর এই স্বপ্নপুরীর চিহ্নও রহিবে না ...দেখিতে হইবে, সব শূন্য; পৃথিবী শবের মতো অসাড়; বৃথাই সে অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়াছে ...। (জগদীশগুপ্ত, ২০১১ : ৯৭)

জীবনের এ বাস্তব সত্য ক্ষণপ্রভার অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে ক্ষণপ্রভা নিজের ভেতর ক্ষয় হতে লাগল। শেষ মুহূর্তে দীনতারণের কাছে অনিচ্ছাকৃত সমর্পণের পর মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত ক্ষণপ্রভা উন্মাদ হয়ে পড়ে। নারীর প্রতি এ অপমান ক্ষণপ্রভার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। ক্ষণপ্রভা মানসিক স্থিতি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু চিরন্তন নারীর মাতৃহৃদয় সন্তানকে আগলে রাখতে ভুলে যায়নি। গল্পের শেষে উন্মাদ, নগ্ন অবস্থায় তাকে আবিষ্কার করে পাঠক। কিন্তু ছেলেটি তার বুকেই ছিল।

চিরপরিচিত পুরুষশাসিত সমাজে নারী তার দেহ, মন, আত্মা দিয়ে স্বামীকে, সংসারকে ভালোবাসে। কিন্তু বিনিময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ তাকে দেয় অবহেলা, অপমান – মনে করে তাদেরকে এক খণ্ড মাংসপিণ্ড। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে নারীর প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে আসে। ক্ষণপ্রভা পারেনি এ প্রচলিত মানসিকতার সাথে আপস করে চলতে। ভালোবাসার অমর্যাদা, অপমান সহ্য করতে না পারায় তার এ করুণ পরিণতি।

নারীর স্বকীয়তার প্রকাশ দেখা যায় 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' গল্পের মাখন চরিত্রেও। মাখনবালার স্বামী সাতকড়ি মধুডাঙার মেলায় অন্য নারীর সাথে ফুর্তি করতে গিয়ে ধরা পড়ে কারাবরণ করে। মাখন সাতকড়ির মুক্তির দিনের প্রতীক্ষা করেছে। স্বামীকে কাছে পাবার আগ্রহে নয়, কীভাবে স্বামীর মুখোমুখি হতে হবে এই ভয়ে। অন্য নারীর প্রতি সাতকড়ির আসক্তি মাখনবালাকে ক্ষত-বিক্ষত করে। নারী/ স্ত্রীকে অপমান করার এ প্রবৃত্তি মাখনবালা মেনে নেয়নি। মাখনবালার এ অন্তর্জগতকে বোঝার মতো বোধশক্তি সাতকড়ি ও তার মার না থাকায় অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। তারা বিদ্রোহী মাখনবালাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। মাখনবালা তার স্বামীর কাছে শরীরসর্বস্ব নারী হয়ে ধরা দিতে চায়নি। নারী চায় তার প্রাপ্য মর্যাদা, আত্মসম্মান। এ দুয়ের সাথে কোনোভাবেই আপস চলে না। প্রতিবাদের কারণে মাখনবালা ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। "একটা ভয়ার্ত একাকিত্বের শূন্যতা স্বামীর সংসর্গকে যে ধুয়ে মুছে দিয়েছে তারই বর্ণনা গল্পটির প্রাণ।" (উজ্জ্বলকুমার, ১৯৯৩ : ৫৯) এই যে নারীর স্বাধীন মনোবৃত্তি, নারীর নিজের কাছে নিজের মর্যাদা ও মূল্যায়ন – তা একান্তই বাস্তবগ্রাহ্য করে জগদীশ গুপ্ত যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি সমস্ত নারীর মনোজগৎ যে একই ধারায় প্রবাহিত নয়, কখনো কখনো নারীর মানসিক প্রবৃত্তি বা চেতনা বিপরীত স্রোতেও প্রবাহিত হয় তার দৃষ্টান্তও তাঁর গল্পে খুঁজে পাওয়া যায়। নারীর কাছে দেহজ প্রেম, বাহ্যিক চাহিদা, আবার কারো কাছে তা দুয়ের সম্মিলন, তার প্রতিচিত্র দেখতে পাই 'অরূপের রাস', 'শঙ্কিতা অভয়া,' 'আঠারো কলার একটি', 'রসাভাস', 'আদি কথার একটি' প্রভৃতি গল্পে।

নারী রহস্যময়ী, নারী সৌন্দর্যময়ী, নারী গৃহলক্ষ্মী, নারী ছলা-কলার কেন্দ্র। সামাজিক চেতনায় নারীর এসব বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় 'আঠারো কলার একটি' গল্পে। ছাব্বিশ বছরের বেণুকরের কাছে জীবন একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে বলে মনে হয়। বেণুকরের স্ত্রী জানকী সাংসারিক মেয়ে । তার সাংসারিক কাজে দোষ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। তারপরও বেণুকরের মনে কিসের যেন অতৃপ্তি, অশান্তি। বেণুকরের মনে হলো – "জীবনের মধুস্বাদে যে অপরিমেয় নিবিড়তা ছিলো তা যেন আর নেই–তৃষ্ণা যেন নিঃশেষ হয়ে মিটছে না – কে যেন দ্রাক্ষারসে জল ঢেলে দিয়েছে।" (জগদীশগুপ্ত, ২০১ : ২০৫-২০৬) সুখের অন্বেষায় বেণুকর ভাবে মেয়েদের যে আঠারো কলা জানা আছে শুনেছিল! তাহলে তার জীবন ঘর-সংসার আর কাজের মাঝে সীমাবদ্ধ কেন? বেণুকরের এ বাসনার কথা জানতে পেরে জানকী মাগুর মাছকে কেন্দ্র করে এমন নাটকীয়তার সৃষ্টি করল যে বেণুকর তার কাছে অসহায় হয়ে পড়ল। নারী যে বৈচিত্র্যপ্রিয়, আঠারো কলার অধিকারী জানকী চরিত্র রূপায়ণের ভেতর দিয়ে জগদীশ গুপ্ত তা-ই উন্মোচন করতে চেয়েছেন।

নারীর আত্মিক প্রেমের প্রকাশ কখনো কখনো যে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তার রূপ দেখতে পাই 'অরূপের রাস' গল্পে। উত্তম পুরুষের বয়ানে বর্ণিত গল্পে রাণু

তার বাল্যসাথী। বাল্যের সখ্য আস্তে আস্তে কখন যে পরিণত প্রেমে রূপ নিয়েছে তা বোঝার আগেই রাণুর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। জাতিভেদের ধারণা দুজনের ভেতর প্রবল মাত্রায় না থাকলে হয়তো এর পরিণতি অন্যরকম হতে পারত। ভালোবাসার অস্তিত্ব যখন দুজনেই উপলব্ধি করতে পারল তখন জীবন তাদেরকে দুই বিপরীত মেরুতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দুজনের ভিন্ন সংসার। কিন্তু আত্মার অতৃপ্তিকে রাণু কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারেনি। ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাবার বাসনা প্রতিনিয়ত তাকে অস্থির করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত তার সহধর্মিণী ইন্দিরাকে অবলম্বন করে সে অতৃপ্তির তৃপ্তি মেটাল। এক অস্বাভাবিক চিন্তার প্রতিফলন রাণু চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার চেয়ে একটু আলাদা মানসিকতার প্রতিফলন, একটু অন্য রকম পরিণতি। ভালোবাসার মানুষের স্পর্শ পাওয়ার ব্যাকুলতায়, সমাজ-স্বীকৃত পথ খোলা না পেয়ে রাণু তার স্ত্রীর শরীর থেকে সমস্ত স্পর্শ মুছে নিজের করে নিয়ে নিল। আত্মার অতৃপ্তি অস্বাভাবিক কামনার ভেতর দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটল। নারীর এই যে আলাদা বৈশিষ্ট্য, অন্য সব নারীর চাহিদার চেয়ে নিজেকে আলাদা করে প্রকাশ – এ শুধু জগদীশ গুপ্তের চোখে ধরা পড়েছে। আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা নারীর স্বকীয়তা প্রকাশে তাঁকে সাহায্য করেছে।

নারীর যে দেহজ কামনা আছে এবং নারী সে-কামনার কাছে আত্মসমর্পণের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে এ বাস্তব সত্যকে 'আদি কথার একটি' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন জগদীশ গুপ্ত। হরির স্বামী বেণী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে খুনের মামলায় ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলে। তখন থেকে গ্রামে দাসদের অসহায়ত্ব শুরু হয়। দাসেরা সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। শুধু সুবল আর গোপাল দাস গ্রামে রয়ে যায়। এদিকে গোপালের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাঞ্চন দুই কন্যা সন্তান নিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই বিধবা হল। বিধবা কাঞ্চনের প্রথম কন্যার অনেক আগে বিয়ে হয়েছিল। পাঁচ বছরের খুশীকে নিয়ে কাঞ্চনের জীবন-যাপন। কৌশলে সুবল কাঞ্চনের মেয়ে পাঁচ বছরের খুশিকে বিয়ে করে। কিন্তু মনের গহীনে বাসনার লেলিহান শিখা জ্বলতে থাকে কাঞ্চনের যৌবন ও রূপের জন্য। কাঞ্চন সমাজ আর নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অসংখ্যবার সুবলের উত্তপ্ত ছোঁয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুবলের পশুত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সমাজে একজন বিধবা নারীর অসহায়ত্ব, অসম বয়সের বিয়ের পরিণতি, পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি, সমাজ ও সমাজের মানুষের নির্মমতার সূক্ষ্ম রূপায়ণ ঘটেছে এ গল্পে। কাঞ্চন সুবলকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, আবার সুবলকে অস্বীকার করার মতো মানসিক জোর বা শক্তি কোনোটাই তার ছিল না। শেষ পর্যন্ত কাঞ্চনকে দেহজ কামনার কাছে হার মানতে হয়।

দেহজ কামনা আর বিত্তের কাছে বিসর্জিত নারীর চিত্র পাওয়া যায় 'রসাভাস' গল্পের সূর্যমুখী চরিত্রে। রূপের আড়ালে অর্থ লিপ্সা তার কাছে প্রবল হয়ে ওঠে। 'প্লেটোনিক লাভে'র মাহাত্ম্য উপলব্ধির ক্ষমতা সূর্যমুখীর নেই। হৃদয়নাথ সূর্যমুখীর রূপে মুগ্ধ হয়ে

তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিল। সুন্দরের আরাধনায় হৃদয়নাথ সূর্যমুখীকে সূর্যমুখীই ভেবেছিল। হৃদয়নাথের চিন্তার স্রোতে সূর্যমুখী সমস্ত সুন্দরের ধারক। হৃদয়নাথ ভেবেছিল সূর্যমুখী সব কলুষতাকে ছাড়িয়ে হৃদয়ের সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে থাকবে। দৈবাৎ সূর্যমুখীর ভেতরের কদর্যরূপ হৃদয়নাথের দৃষ্টিগোচর হয়। হৃদয়াসনে যাকে এতবড় স্থান দিয়েছিল, সে হৃদয় সূর্যমুখী ভেঙে চূর্ণ করে দিল। সূর্যমুখীর এরূপ যে নগ্ন রূপের মোহে লোকভুলানো আর তা দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা এ কথা উপলব্ধি করে হৃদয়নাথের মন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। হৃদয়নাথের হৃদয়ে আর কখনো সূর্যমুখীর আভা দেখা গেল না। "কামনা ও কুপ্রবৃত্তি আদিকাল থেকে এই সমাজমানসের মধ্যে, সংগোপনে বসবাস করে আসছিল তা অপরিবর্তিতভাবে আজও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহমান। দুরপনেয় এই সমাজসত্যই জগদীশ গুপ্তের অম্বিষ্ট।" (মান্নান, ২০০১ : ৫৫)

জীবনের বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে আত্মিক বিকাশ সব নারীর মনোজগতে সিদ্ধ হয় না, তারই রূপায়ণ 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্প। অভয়া একদা মেয়ে শান্তিময়ীকে নিয়ে অতুলের জন্য ঘর, সংসার, সমাজ সব ছেড়ে এসেছিল। যে ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসার জোর তাকে ঘরছাড়া করেছিল, সে ভালোবাসার মানুষটিকে বিশ্বাস করার মতো মনের জোর অভয়ার ছিল না। অতুল যে শান্তিময়ীর সত্যিকারের বাবা হওয়ার যোগ্যতা রাখে, সে বিশ্বাস অভয়ার ছিল না। অতুলের সঙ্গে শান্তিময়ীর সহজ, স্বাভাবিক সম্পর্ককে অভয়া স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। অতুল নিজের জীবনের শিক্ষা, বিশ্বাস সব কিছু দিয়ে গড়ে তুলতে চায় মেয়ে শান্তিময়ীর জীবন। বাধা হয়ে দাঁড়ায় অভয়া। রক্ত সম্পর্ক ছাড়া বাবা হবার অধিকার বা যোগ্যতা একজন পুরুষের থাকতে পারেনা– এ চিন্তার প্রকাশ ঘটে অভয়া চরিত্রে। নিজের ঘর ছাড়ার পাপবোধ তাকে ভেতরে ভেতরে তাড়িয়ে বেড়ায়। অতুলের প্রতি মোহ, আকর্ষণ একসময় ফিকে হয়ে পড়ে। অভয়ার বিশ্বাসে ফাটল দেখা দেয়। মা হিসেবে মেয়ের জন্য শঙ্কা অনুভব করে। বাস্তব সত্যের মখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় মেয়েকে। 'অতুল তার বাবা নয়' – এ সত্য শান্তিময়ীর মনকে কতখানি নির্মমতায় আর অশান্তির অমানিশায় নিক্ষিপ্ত করেছে তা অভয়া উপলব্ধি করতে পারেনি এবং বুঝতেও চায়নি। গল্পে অভয়া চরিত্রটি স্থূল মানসিকতা, নারীর জীবনে অনিশ্চয়তার আশঙ্কা এবং সমাজে তার অবস্থানকে স্পষ্ট করে। অতুলের ঔদার্য, শিক্ষা, সংযম সবকিছুকে উপেক্ষা করে অভয়া অতুলের সহধর্মিণী হওয়ার পরিবর্তে হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র গতানুগতিক এক নারী। নারীর শুধু মোহ থাকবে, কাছে পাবার বাসনার মতো ভালোবাসা থাকবে। এর বাইরে চিন্তা করার, বোঝার, জগতকে দেখার, জানার, চেনার মানসিকতা নারীর মনোজগতে স্থান দেয়া অন্যায় আর অশোভন। এ মানসিকতা থেকে অভয়া বেরিয়ে আসতে পারেনি। পুরুষের পাশাপাশি নারীর সহাবস্থানের মানসিকতা সব নারী ধারণ করতে পারে না। নারীর জীবন শুধু দেহজ

কামনা-বাসনা আর ঘর সংসারে সীমাবদ্ধ। এই চির পরিচিত, পুরাতন ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার মানসিকতা সবার থাকে না। শান্তিময়ীর মতো মেয়েদেরও তাই গতানুগতিক ধারণা লালন করতে বাধ্য করা হয়। নারী মনস্তত্ত্বের এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপায়ণ জগদীশ গুপ্তের গল্পেই চোখে পড়ে।

জগদীশ গুপ্ত নারীর স্বকীয়তা, নারীর মানসিকতায় বৈচিত্র্য, সমাজে নারীর অবস্থানকে তুলে ধরার পাশাপাশি নারীর চির-পরিচিত, মঙ্গলময়ীরূপ ও মাতৃরূপ অঙ্কনেও সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। নারী মমতাময়ী। সন্তানের মঙ্গলের চিন্তা সবার আগে মায়ের মনে বিরাজ করে। একজন নারী তার মমতার আড়ালে মাতৃত্বের স্বরূপকেই স্পষ্ট করে তোলেন। চারপাশের জগৎ যা দেখতে পায় না, একজন মায়ের অন্তর্দৃষ্টি সবার আগে তা টের পায়। রতি নাপিতের স্ত্রী নারানী তিনটি পুত্রকে জন্মের পর হারিয়ে, অনেক চেষ্টা-আশা-আকাঙ্ক্ষার বদৌলতে একটি পুত্রকে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। সে তাদের পাঁচ বছর বয়সের পাঁচু। ভাগ্যের লিখন বা নিয়তি তাড়িত হয়েই হোক পাঁচুর মুখ দিয়ে বের হয়েছিল "মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।" পাঁচুর অসংলগ্ন মুখের কথা না সত্যি হয়ে যায়, সে জন্য নারানী যার পর নাই সতর্ক ছিল। নারানীর মনের মধ্যে ভয় জেগে রইল সর্বদা। কিন্তু সে ভয়কে সত্য প্রতিপন্ন করে পাঁচুকে সত্যিই কুমিরে নিয়ে গেল। মূর্ছিতা জননী সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পেল না। পেলে কী হতো তা হয়তো একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারতেন। 'দিবসের শেষে' গল্প নিয়তিতাড়িত এই হতভাগিনী মায়ের করুণ আর্তনাদের কাহিনি।

'পয়োমুখম্' গল্প অর্থলোভে কীভাবে দুটি বালিকার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠলো তারই বেদনাঘন, নির্মম চিত্র। ভূতনাথের পিতা কবিরাজ শ্রী কৃষ্ণকান্ত সেন-শর্মা কবিভূষণ মহাশয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে চিকিৎসা করে অর্থ উপার্জন করেন। বাল্যবয়স থেকে ছেলে ভূতনাথকেও সে-বিদ্যা শেখানোর চেষ্টা করেছে। কৃষ্ণকান্তের কারণে ভূতনাথ তিনটি বিয়ে করতে বাধ্য হয়। প্রথম স্ত্রী নয় বছরের মণিমালিকা, দ্বিতীয় স্ত্রী অনুপমা। মণিমালিকা ছিল বালিকা, ভূতনাথের খেলার সাথী, আর অনুপমা উদ্ভিন্ন-যৌবনা। দুজনেই ভূতনাথের মা মাতঙ্গিনীর মনের মধ্যে আলাদা আসন তৈরি করেছিল। দুজনের প্রতিই প্রবাহিত ছিল মাতঙ্গিনীর মাতৃস্নেহের ফল্গুধারা। মাতঙ্গিনী মায়ের ভালোবাসা দিয়ে তাদের অন্তরকে উপলব্ধি করেছেন। জ্বরের প্রকোপে দুজনেই মৃত্যুবরণ করে। পর পর দুই স্ত্রীর মৃত্যুর পর কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথকে তৃতীয়বার বিয়ে করতে বাধ্য করে। তৃতীয় স্ত্রীর নাম বীণাপাণি। বীণাপাণির উপস্থিতি মাতঙ্গিনীর মনে মাতৃস্নেহকে আবার উস্কে দেয়। মাতঙ্গিনীর মণিকোঠায় ঘুরপাক খায় প্রথম বউ মণি; যে কিনা শাশুড়ির সাথে ভয়ে ছায়ার মতো ঘুরত। দ্বিতীয় বউ অনুপমা তাকে পরোয়া না করলেও পুত্রের প্রিয়তম বলে মাতঙ্গিনীকে ভালোবেসেছিল। আর বীণাপাণির

স্পর্শে সেবা কী মধুর, মাতঙ্গিনী জীবনে তা প্রথম উপলব্ধি করল। এবার সেই পরিচিত জ্বর বীণাপাণিকেও আক্রান্ত করলে মাতঙ্গিনীর বুকের ভেতর দুশ্চিন্তা দেখা দিল। মনে পড়ে আগের দুটি বউ এমনি করে মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। তাই এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বার বার ঈশ্বরকে ডাকে। ঈশ্বর যেন এ বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করে। মাতঙ্গিনী জানে না এদের মৃত্যু-রহস্য। শুধুমাত্র তার মাতৃহৃদয় থেকে থেকে কেঁদে ওঠে আর প্রার্থনা করে আবার যেন পূর্বের কষ্টের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

মায়ের মমতার বিচিত্ররূপ খুঁজে পাই 'চন্দ্র সূর্য যতদিন', 'আদি কথার একটি', 'শঙ্কিতা অভয়া', 'হাড়', 'মায়ের মৃত্যুর দিন' প্রভৃতি গল্পে। প্রতিটি গল্পেই মায়ের মমতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়েছে। ব্যতিক্রম 'হাড়' গল্পটি। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচার (দৈহিক ও মানসিক) আমাদের সমাজে অতি পুরাতন প্রথার মতো স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গল্পে ছয় বছরের একটি ছেলেকে রেখে রক্ষা মারা গিয়েছিল। রক্ষা 'হাড়' গল্পে সনাতনের স্ত্রী। রক্ষার মৃত্যু স্বাভাবিক বলে এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায়নি। শুধু মুখ খুলল রসি। রক্ষা রসিকে মাসি বলে সম্বোধন করত। রক্ষা তাই জীবনের শেষ সময়ে মাসিকেই শেষ অবলম্বন মনে করেছিল। মৃত্যুর সময় রক্ষা রসি মাসিকে বলে গিয়েছিল তার পুত্র মথুরকে সে যেন দেখে রাখে। রক্ষার মৃত্যু সমাজের চোখে স্বাভাবিক। কিন্তু এ মৃত্যুর পেছনের অন্তর্সত্যকে কেউ উদ্‌ঘাটন করতে চায়নি। "...শুধু আয়ুঃশেষ হইয়া যায় বলিয়াই মানুষ মরে এমন নয়; আয়ু থাকিতেও বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছাটার যদি মৃত্যু ঘটে তাহা হইলেও মানুষ মরে।" (জগদীশ গুপ্ত, ২০১১ : ১৪০) জেগে উঠে রসির মাতৃহৃদয়; রক্ষার জন্য এবং রক্ষার পুত্রের জন্য। রসি ভেবেছিল যে, মথুরকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করবে। মথুরের বাবা সনাতন বিষয়টি জানতে পেরে রসিকে 'মাগি', 'ডাইনি' বলে গাল দেয়। রসির মাতৃহৃদয়কে অপমান করে সনাতন। বুকের ভেতর রসির অপমানের আগুন জ্বলে ওঠে। ক্ষত-বিক্ষত, অপমানিত মাতৃহৃদয় থেকে অভিশাপ নির্গত হল। নিয়তির কী অবোধ বিচার! অভিশাপ বাস্তবতায় পর্যবসিত হল। মাছের কাঁটা আটকে গেল সনাতনের গলায়। মাতৃহৃদয়ের হাহাকার কতখানি ভয়াবহ হতে পারে সনাতনের করুণ দৃশ্য সে-সত্য প্রমাণ করে।

'মায়ের মৃত্যুর দিন' গল্পে সব সন্তানের প্রতি যে মায়ের ভালোবাসা সমান তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মায়ের কাছে সব সন্তানই সমান। মায়ের প্রতি সন্তানের প্রকৃত ভালোবাসা একজন মা-ই কেবল উপলব্ধি করতে পারে। সে সন্তান মায়ের কাছে থাকুক আর দূরে থাকুক। এ গল্পে বড় পুত্র কেশবলাল আর তার স্ত্রী সরোজিনী সম্পত্তির লোভে মাকে অনেকটা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। মা তার আরেক পুত্র

রঙ্গলালের প্রতীক্ষা করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তানের চিন্তাই মায়ের কাছে বড় ছিল। "গল্পে পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রীর অন্ধ পৌশাবিক অর্থলোলুপতা জীবনের প্রতি অকল্পনীয় ধিক্কারের অন্ধতায় গগনচুম্বী হয়ে উঠেছে; যদিও নিছক বাস্তবতার বিচারে এ-পরিকল্পনাকে সহজেই সম্ভব বলে স্বীকার করা এ-কালেও দুরূহ।" (ভূদেব, ২০১৩-১৪ : ৩৬৩)

মাতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, নির্ভরতা যেমন জগদীশ গুপ্তের গল্পের বিষয়বস্তু, তেমনি ভালোবাসার বিপরীত স্রোত কীভাবে সন্তানকে নষ্ট পথে নিয়ে তার সকরুণ চিত্র পাই 'বোনঝি গুঞ্জমালা' গল্পে। স্বামীর মৃত্যুর পরে মহেশ্বরীর জীবনে অভাব নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। বোনের মৃত্যু তার সে সমস্যাকে আরো ভয়াবহ করে তোলে। বোনঝি গুঞ্জমালাকে নিয়ে আসতে বাধ্য হয় অভাবের সংসারে। নিজের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে আভরণে আর আবরণে সাজিয়ে তোলে বোনঝি গুঞ্জমালাকে। লোক-দেখানো মাতৃত্বের আড়ালে মহেশ্বরীর মানসিকতায় ছিল স্বার্থপরতা আর শঠতা। বোনঝিকে দিয়ে মহেশ্বরী অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন করাতে চায় এবং নিজের অভাব মোচন করতে চায়। মাতৃত্বের কলঙ্ক মহেশ্বরী। মার সমতুল্য মাসি তাকে রক্ষা করার পরিবর্তে অসৎ পথে ঠেলে দিতে চেয়েছিল।

লোভ-লালসা কীভাবে ব্যক্তি-জীবনকে ধ্বংস করতে পারে 'বোনঝি গুঞ্জমালা' গল্প ছাড়াও 'পয়োমমুখম্', 'চার পয়সায় এক আনা', 'প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী', 'পুরাতন ভৃত্য' প্রভৃতি গল্পে দেখতে পাই। লোভ-লালসার প্রকাশ মানব চরিত্রের নেতিবাচক দিক। লোভের কারণে ঘটে মানুষের নৈতিক স্খলন। মানুষ ভুলে যায় ভালো-মন্দ, হিতাহিত জ্ঞান। যে-কোনো অপকর্ম করতে তখন তাদের বাধে না। নিষ্ঠুরতা তাদের বিবেককে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। তাতে আক্রান্ত হয় ব্যক্তি, সমাজ। 'পয়োমমুখম্' গল্পে কৃষ্ণকান্ত লোভের তাড়নায় ঔষধ সেবন করিয়ে পুত্রবধূদের হত্যা করেছেন। শ্যামবর্ণ বলে বীণাপাণির বাবাকে বাধ্য করেছেন মাসে মাসে অর্থ পাঠানোর জন্য। শেষ পর্যন্ত পুত্রের কারণে অর্থ আদায় করতে না পেরে বীণাপাণিকেও মারতে চেয়েছেন। অপ্রাপ্ত বয়সের কারণে ভূতনাথ প্রথম দুই স্ত্রী মণি ও অনুপমার মৃত্যুর কারণ বুঝতে পারেনি। পরে বুঝতে পেরে বাবার অপকর্ম থেকে ভূতনাথ বীণাপাণিকে বাঁচাতে পেরেছে। পিতা হয়েও সন্তানের সুখের চেয়ে অর্থই যাদের কাছে সবচেয়ে বড়, আমাদের জগৎ-সংসারে এ রকম বৈশিষ্ট্য ধারণ করা চরিত্রের অভাব নেই। জগদীশ গুপ্তের জীবনাভিজ্ঞতা এসব চরিত্র রূপায়ণে সহায়তা করেছে। "মানুষের লোভ এবং দুর্দমনীয় প্রবৃত্তির প্রভাবে সাংসারিক সম্পর্ক, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি মানবিক অনুভূতিগুলি কতখানি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে এই গল্পটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।" (বিশ্ববন্ধু, ১৯৯৩ : ৫) অন্যদিকে সন্তানও যে পিতার ভালোবাসা, আদর্শকে স্বার্থের জন্য বিসর্জন দিতে পারে তার প্রমাণ 'পামর' গল্পটি। একজন পিতার শেষ আশ্রয়স্থল তার

সন্তান । সে-সন্তান যখন স্বার্থের জন্য পিতার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যে করে ব্যবহার করতে পারে তখন জগৎ সংসারে পিতা-পুত্রের সম্পর্কে আর কোনো আশার উৎস থাকে না। তখন জগৎ-সংসার একজন পিতার কাছে মিথ্যা ও শূন্য হয়ে যায়।

এক আনি পয়সা কীভাবে অভাবের সংসারে লোভের ইশারা দেয়, কীভাবে আপনজনদের মাঝে ভাঙনের সুর তোলে তারই নগ্ন চিত্র 'চার পয়সায় এক আনা' গল্পে। কুড়িয়ে পাওয়া মাত্র এক আনি পয়সা পারিবারিক বন্ধন শিথিলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। টাকার লোভ একজন ভৃত্যকে ডাকাত করে তোলে। অসহায় বিন্দ্যপ্রসাদ ওরফে নবকে বিশ্বেশ্বর একসময় সন্তান স্নেহে তার গৃহে লালন-পালন করে। সংসারে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ভৃত্যরূপে নব সর্বদা বিশ্বেশ্বরের পাশে ছিল। বিশ্বস্ত ভৃত্য নব সুযোগ পেয়ে বিশ্বেশ্বরকে অর্থের লোভে মৃত্যুর কোলে ছেড়ে দিয়ে অর্থ নিয়ে পালিয়ে যায়। শিষ্যবাড়িতে প্রভুর অনুগত রূপ নবকে আরো বেশি সাহসী করে তুলেছিল। বিশ্বেশ্বরের বাড়িতে অবস্থানকালীন নব প্রভুকে শক্তিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে জানত। সে প্রভু যে এতটা অনুগত শিষ্য বাড়িতে প্রভুর এ নতুন রূপ না দেখলে বিশ্বাস করা কষ্টকর হত। শিষ্য বাড়িতে বিশ্বেশ্বর তার পরিচিত রূপ ছেড়ে সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে নবর সামনে ধরা দিয়েছে।। নবও তার নতুন রূপে প্রভুর সামনে দেখা দিল। অর্থসহ প্রভুকে একা পেয়ে স্নেহ-মমতা-বিশ্বাসের চেয়ে অর্থলোভ নব-র কাছে বড় হয়ে ওঠে। বিশ্বাস ভঙ্গের এমন চমৎকার রূপায়ণ জগদীশ গুপ্তের রচনায়ই সম্ভব। "এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্যে'র পাল্টা জবাব।" (বিশ্ববন্ধু, ১৯৯৩ : ৪)

জগদীশ গুপ্ত মনুষ্য চরিত্রের শুধু অর্থলোভী রূপ আঁকেননি। পুরুষের নারী-লোলুপ দৃষ্টি ও একাধিক নারীর সাহচর্য পাবার মানসিকতা যে আমাদের সমাজে বিরল নয় এ রকম চিত্র তুলে ধরতে ভুলেননি তিনি। আমাদের সমাজে কিছু পুরুষের চরিত্র এমন যে তারা তাদের মনোবাসনা চরিতার্থের জন্য যতটা কূট-কৌশলের আশ্রয় নেয়া যায় তা নিয়ে থাকে। এ ধরনের চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই 'প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী' গল্পের সদু খাঁ চরিত্রে। জসিমের সুন্দরী বউকে পাওয়ার বাসনায় এমন কেনো কৌশল নেই যা সদু খাঁ অবলম্বন করেনি। শেষ পর্যন্ত সদু খাঁর কৌশল জয়ী হয়। স্ত্রীকে ভালোবেসে, সদু খাঁকে বিশ্বাস করে জসিম শেষ পর্যন্ত শূন্য হাতে ফিরে আসে। অভাব জসিমকে ভাগ্যতাড়িত করেছে, অভাব তার স্ত্রীকেও আর তার কাছে ফিরিয়ে আনেনি। ভাগ্যের কী চরম নিষ্ঠুরতা!

জগদীশ গুপ্ত ব্যক্তিজীবন ও সমাজের প্রতি স্তর থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ব্যক্তির অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, জ্যোতির্বিদ্যায় ফাঁক, ভৌতিক আবহ তৈরি, ঠক, প্রবঞ্চক, পিতৃহন্তারক, সর্বোপরি নিয়তির দায়ভাগকেও জগদীশ গুপ্ত এড়িয়ে চলেননি। জীবন চলার বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পের ভাঁজে ভাঁজে বিষয়বস্তুকে

প্রাসঙ্গিক করে তুলতে সহায়তা করেছে। সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের থেকে এখানেই জগদীশ গুপ্ত স্বতন্ত্র ও সার্থক।

মানুষের মন বিচিত্র ও জটিল। প্রতিটি মানুষের মানসিক তৃপ্তি কোথায় যে লুকিয়ে থাকে বোঝা দুষ্কর। দান করা উচিত মুক্ত হস্তে। আমাদের সমাজে কিছু ব্যক্তি দানের প্রতিদান আশা করে। তারা দানের আড়ালে আশা করে প্রভুত্ব আর ভক্তির প্রকাশ। শুধু তাই নয়, দানের বিনিময়ে চায় দান গ্রহণকারীর প্রতি সমস্ত অধিকার আয়ত্ত এবং তার সত্তার বিসর্জন। 'গুরুদয়ালের অপরাধ' গল্পে চন্দ্রশেখর সান্যাল আর গরিব গুরুদয়াল চরিত্রে এ সব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন জগদীশ গুপ্ত দক্ষতার সাথে। চন্দ্রশেখর আবিষ্কার করে গুরুদয়ালের চরিত্রে পরসেবাবৃত্তি আর দাস্যই প্রবল। ভিক্ষুকরা সাধারণত দশ দরজায় ভিক্ষা মাগে, তাদের মুখে থাকে সবার জন্য স্তুতি। তারা মন দিয়ে শুধুমাত্র একজনের আরাধনা করে না। গুরুদয়াল এ দিক থেকে ব্যতিক্রম। দানের বিনিময়ে চন্দ্রশেখর সদা গুরুদয়ালের কাছ থেকে প্রভুভক্তি পেয়ে এসেছে। এতে চন্দ্রশেখর আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে এবং গুরুদয়ালের প্রতি অনুকম্পা দেখিয়েছে। যখন জানতে পারল গুরুদয়ালের মাসি মৃত্যুর সময় তাকে তিন হাজার টাকা দিয়েছে তখন চন্দ্রশেখর ভেতরে ভেতরে যারপর নাই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার আঁতে ঘা লাগে। চন্দ্রশেখর বুঝতে পারল দানের অনুগ্রহ আর ভক্তি কোনোটাই তার প্রয়োজন নেই। যে দানে প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারবে না, অধিকার জাগাতে পারবে না, অনুগত করে রাখতে পারবে না সে-দানের আর কী প্রয়োজন। চন্দ্রশেখর গুরুদয়ালকে তার কাছে আসতে নিষেধ করে দিল। মনের বিচিত্র রূপ আর তার জ্বলন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে এ গল্পে।

'আমি ও দেবরাজের স্ত্রী' গল্পে ব্যক্তির আত্মঅহংকার আর সে-অহংকারী মনে নারীর অবস্থানের রূপ তুলে ধরেছেন জগদীশ গুপ্ত। উত্তমপুরুষে বর্ণিত গল্পে কথক চরিত্রটি সুশিক্ষিত, সুদর্শন ও কবি।। শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী করে, কিন্তু তাকে করে তুলেছে অহংকারী। তার মনে অহংকার ছিল – জগতে যা কিছু ভাল, সুন্দর তার সব কিছু পাওয়ার যোগ্যতা শুধু তার। সে-ই শুধু উপযুক্ত। সব সুন্দরী রমণী তাকেই বরমাল্য দিবে। বাল্যবন্ধু দেবরাজের স্ত্রী খুব সুন্দরী, এ তথ্য জানার পর থেকে তার ভেতর শুরু হয় মানসিক পীড়ন। মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সে। দেবরাজের মতো ব্যক্তির সুন্দরী স্ত্রী পাওয়ার যোগ্যতা নেই। এ বোধ তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে থাকে সে। তার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হয়। আত্মঅহংকার যে মানসিক শান্তিকে নষ্ট করে, মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করে, ব্যক্তিকে ভুল পথে ধাবিত করে তার বাস্তব উদাহরণ এ গল্প।

জগদীশ গুপ্ত মানুষের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যকে পরখ করেছেন। নিয়তির ভূমিকাকে জগদীশ গুপ্ত অস্বীকার করেননি। 'বিধবা রতিমঞ্জরী', 'দিবসের শেষে', 'হাড়', 'যাহা ঘটিল

তাহাই সত্য', 'তৃষিত আত্মা' প্রভৃতি গল্পে নিয়তিতাড়িত জীবনকে প্রত্যক্ষ করা যায়। মানুষের জীবনের পরিণতিতে নিয়তির ভূমিকা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। জীবনে স্বাভাবিক ঘটনার পাশাপাশি মানুষের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, জ্যোতিষবিদ্যার ফাঁকির দিকটি জগদীশ গুপ্তের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। 'যাহা ঘটিল তাহাই সত্য' গল্পের রাধামাধবের অন্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস তার দ্বিতীয় সন্তানের মৃত্যুর বাস্তবতায় পর্যবসিত হয়। জ্যোতিষার্ণবের ভবিষ্যৎবাণীর নগ্ন সত্যকে বাস্তবগ্রাহ্য করে প্রকাশ করার দুঃসাহস জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন। 'তৃষিত আত্মা' গল্পে ভৌতিক আবহ তৈরিতেও জগদীশ গুপ্ত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সীতাপতির হঠাৎ মৃত্যুতে তার পরিবারে বেদনা ও ভয়ের আবহ শুরু হয়। লক্ষ্মীর সন্তানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে-ভয় বাস্তবে পরিণত হয়। জীবনে যা কিছু ঘটে তার সব রহস্য মানুষ উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। অতৃপ্ত আত্মা সংসারের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, কখনো কখনো তারা কারো কারো ওপর ভর করে – এ দর্শন লক্ষ্মী চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্মী নিজ সন্তানের অমঙ্গল চিন্তায় শিহরিত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সন্তানের মৃত্যু সে-চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেয়।

প্রতিনিয়ত জীবনকে উপলব্ধির প্রচেষ্টা জগদীশ গুপ্তের মৌল প্রেরণা। গ্রামীণ আবহে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেও কল্লোলের সময় ও পরিবেশকে যাঁর লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় তিনি জগদীশ গুপ্ত। জটিল জীবনরহস্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর রচনাকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে। তিনি হয়ে উঠেছেন সমসাময়িক সবার চেয়ে আলাদা ও ব্যতিক্রমী। স্মৃতির স্মারক রেখে গেছেন গল্পের প্রতিটি চরিত্রের ভাঁজে ভাঁজে। যে মানসিক টানাপড়েন সমাজের নৈতিক অনুশাসনের আড়ালে চাপা পড়েছিল তাকে তিনি টেনে বের করে এনে শিল্পমাত্রায় রূপান্তরিত করেছেন। স্বাভাবিক জীবন-যাপনের উল্টো রথে চড়ে তিনি মানুষের মনোজগতে বিচরণ করেছেন। হৃদয়ের একান্ত গোপন সত্যকে প্রকাশ করার সাহস দেখিয়েছেন তিনি। সমাজের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে অনুভূতির ভিন্ন মাত্রাকে শৈল্পিক তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন জগদীশ গুপ্ত তাঁর ছোটগল্পে। জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলো হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতারই অভিজ্ঞান।

টীকা

সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত জগদীশ গুপ্তের গল্পগ্রন্থে জগদীশ গুপ্তের রচনাবলীর যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে যে সব গল্পগ্রন্থের উল্লেখ আছে তা নিম্নরূপ : বিনোদিনী (পৌষ ১৩৩৪) ১ এ *অঞ্জন শলাকা* (বইয়ের খোঁজ পাওয়া যায়নি), *রূপের বাহিরে* (৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬), *শ্রীমতী* (১৩৩৭), *উদয়লেখা* (১৮ চৈত্র ১৩৩৯), *তৃষিত সৃক্কনী* (স্বাক্ষরের তারিখ ৩, ৪, '৩৯), *রতি ও বিরতি* (ভাদ্র ১৩৪১), *উপায়ণ* (১৩৪১), *পাইকশ্রী মিহির প্রামাণিক*, *শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী* (বৈশাখ ১৩৪২), *মেঘাবৃত অশনি* (পৌষ ১৩৫৪), *ভৃঙ্গার* (সংগ্রহ করা

যায়নি), *জগদীশচন্দ্র গুপ্তের স্ব-নির্বাচিত গল্প* (১৯৫৯), *কলঙ্কিত তীর্থ* (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭), *জগদীশ গুপ্তের গল্পসমগ্র* প্রথম খণ্ড (বৈশাখ ১৩৯৭), (সুবীর রায় চৌধুরী , ২০১১ : ২১৫-২১৬)

গ্রন্থপঞ্জি

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৩৯৫) । *জগদীশ গুপ্তের গল্প : পঙ্ক ও পঙ্কজ*, ফুলদল প্রকাশনী, ঢাকা

ভূদেব চৌধুরী (২০১৩-১৪) । *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সমরেশ মজুমদার (১৯৮৮) । *বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর*, রত্নাবলী, কলকাতা

সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত (১৯৯৩) । *জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা

সরকার আবদুল মান্নান (২০০১) । *জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত (২০১১) । *জগদীশ গুপ্তের গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা